



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 429 - 437

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সত্তরের জেল আলেখ্যে জয়া মিত্র : প্রসঙ্গ ‘হন্যমান’ ও অন্যান্য

বাসব চক্রবর্তী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: bashabchakraborty0@gmail.com

 0009-0006-3535-3334

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

1970s,
Hanyaman,
Prison Life,
Political and
Ordinary
Prisoners, Jail
Code, Human
Document,
Female Inmates.

Abstract

This article presents a profound and humane analysis of prison life in West Bengal amidst the turbulent political backdrop of the 1970s, viewed through the lens of Jaya Mitra's autobiographical novel, *Hanyaman*. Focusing on Mitra's experiences of incarceration, the essay documents the realistic conditions within the inner precincts of Midnapore, Berhampore, and Presidency jails, along with the prison codes and administrative mismanagement.

The author does not view prison life merely from the 'elite' vantage point of political prisoners; rather, she integrates herself with ordinary convicts, murder accused, socially ostracized women, and 'non-criminal lunatics,' becoming a partner in their joys and sorrows. The article provides a detailed account of the prison's internal economy (barter system), acute water scarcity, inadequate medical facilities, and the inhumane conditions of the wards for the insane.

Special emphasis is placed on how humanity and empathy in Mitra's writing transcend political ideology. This work is not merely a political document of a specific era, but a ruthless yet compassionate chronicle of the lived experiences of women whom society brands as 'criminals' and 'outcasts.' The article offers a theoretical and factual analysis of how strict prison discipline, hunger strikes, and the chemistry of interpersonal relationships among inmates construct a parallel society.

Discussion

নির্বাচিত উপন্যাস ও অন্যান্য প্রসঙ্গে জেলের সময়কে তিনটি পর্বে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, জেলে আবদ্ধ অন্তর্বর্তী সময়। দ্বিতীয়ত, জেলে আবদ্ধ কিন্তু বাইরের সময় এবং তৃতীয়ত, জেল আবদ্ধ অতীত স্মৃতিচারণমূলক সময়। এই সময় পর্বের বন্দিরা— রাজনৈতিক বন্দি, সাধারণ বন্দি, ও অন্যান্য বন্দি। যাদের মধ্যে আছে ‘নন-ক্রিমিনাল লুনাটিক’ অর্থাৎ

‘নিরপরাধ উন্মাদ কয়েদি’, ‘ক্রিমিনাল লুনাটিক’ অর্থাৎ ‘বিচারাধীন উন্মাদ বন্দি’। এই সময়পর্বের জেলযাপন বিশ্লেষণে যে দিকগুলি লক্ষ্য করা হবে সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দিদের আন্তঃসম্পর্ক, জেল-কর্মকর্তাদের বন্দিদের উপর ব্যবহার, উন্মাদ ও অন্যান্য কয়েদিদের জেলজগৎ ব্যবস্থাপনা, মেটদের ব্যবহার প্রভৃতি।

‘হন্যমান’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় নভেম্বর, ১৯৮৯। জয়া মিত্র (১৯৫০) সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলের বন্দিজীবন লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কাহা অভিজ্ঞতা সাড়ে চার বছরের। উপন্যাসটি স্মৃতিকথা থেকে উদ্ভব করে সেই সময়ের কারাগারের অন্তর-দলিল হয়ে গিয়েছে। সাধারণ জনমানস থেকে দূরে আরও একদল মানুষ আছেন যারা সমাজের চোখে অপরাধী, সমাজ তাদের ব্রাত্য করে রেখেছে। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনপর্ব থেকে শৃঙ্খলামুক্ত ঘটনা প্রবাহ একটি সময়ের একটি সমাজকে জীবন্ত করে রেখেছে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাদেরকেই। উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন—

“যাদের কথা এখানে রয়েছে
এসবই তো তাদেরই
আমি উৎসর্গ করার কে—”

উপন্যাস শুরু হয় একটি অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে। যেটা জেলখানা নয়, গ্রেপ্তার হওয়ার পরের ঘটনা। তাকে প্রহৃত করা হয় থানায়। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় কোর্ট হাজিরার জন্য। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল MIDNAPORE CENTRAL JAIL-এ। জেল গেটে তার অভ্যর্থনা হয়েছিল প্রচণ্ড শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে। বোঝা যায় সে একা নয় তার আগেও অনেকে এখানকার সমমানসিক আবাসিক এসে গিয়েছেন। জেল প্রবেশের দিনটি জয়া মিত্রের স্মরণে থাকার অন্যতম একটি কারণ সেদিন জয়ার একুশতম জন্মদিন ছিল। জেল প্রবেশ থেকে নিষ্কৃতি পর্ব পর্যন্ত সময়পর্বে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও যাদের দ্বারা অত্যাচারিত তাদের কথা না ভুলে যাওয়ার অঙ্গীকার সে পালন করেছে। আর তারাও মনে রাখবে আশা করেছে তাদের দুঃসময়ের সাথী সঙ্গি আর এক কয়েদি জয়াকে। তাই সূচনালগ্নেই জানিয়েছেন –

“...কতোজন বার বার বলেছিল, দিদি ভুলে যাবে না তো? নিজের মনে মনেই তার উত্তর দিই এই দেখো—তোমাদের ভুলিনি—গঙ্গা-জয়লক্ষ্মী-মায়া-ইতোয়ারী-হানিফা-আয়তামাঈ কাউকে না। আরো কতজন যারা এখনও বন্ধ আছে কিংবা মরে গেছে হয়তো পাগল হয়ে গেছে কিংবা বাপীদি-মালা-ময়না-নূরজাহানের মত দাঁড়িয়ে থাকো রাস্তায়—যদিও জানি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না—কিন্তু এও জানি তোমরাও কেউ ভোলিনি।”^১

জেল প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের বেডে শুয়ে জয়া মিত্র জেল বর্ণনা করছেন একদিকে নিষ্প্রাণ আর কুশ্রী; অপরদিকে মাধবীলতা— তাতে সবুজেভরে পুঞ্জ পুঞ্জ লালগোলাপী ফুল ফুটেছে। তাঁকে মেদিনীপুর জেলের গ্রামীণ আবহাওয়া প্রবল আকর্ষণ করেছিল। এখানে মেয়েদের ওয়ার্ডে সাঁওতাল মেয়েদের সংখ্যা অনেক। তারা সবাই প্রায় সাধারণ কয়েদী রেলইয়ার্ডে ‘কয়লা চুরি’ সংক্রান্ত কেসের আসামী। এইসব মেয়েদের সঙ্গলাভ এক অন্যধরণের প্রাপ্তি। থানায় প্রহৃত হয়ে জেলে এলেও ভাল-মন্দ দেখার চোখ নষ্ট হয়ে যায়নি।

জেলের পরিভাষাগুলো হয় অন্যরকম। এই জগতের আবাসিক মানুষ ব্যতীত সে ভাষা বোঝা সকলের সহজসাধ্য নয়। জয়া মিত্রও জেল প্রবেশের পর এই পরিভাষাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়। যেমন জেল প্রবেশের পর প্রথম কাজ হাসপাতালের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করান - উচ্চতা, ওজন, শারিরিক চিহ্ন ইত্যাদি পরীক্ষা করে ডাক্তার কয়েদীদের কার্ড লিখে দেয়। একে বলে ‘টিকিট’। এছাড়া ‘লাভ কেস’ (IPC 316) অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরী যারা এই কেসের আসামী। জেলের আর এক পরিভাষা ‘মার্ক’। আসলে ‘গুড কনডাক্ট রিফরমেশন’ অর্থাৎ বন্দিদের ভালো ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে কর্মকর্তাদের সাজার পরিমাণ কমানোর ক্ষমতা থাকে। অথএব এ বহুমূল্যে অর্জিত।

বন্দি পরিচয় : বিভিন্ন শ্রেণি থেকে ব্যক্তি— জয়া মিত্রের পরিচয় হয়েছিল মাদাম রাসোর সঙ্গে। তিনি ফরাসি দেশের ভূগোল পরিষদের সঙ্গে যুক্ত উনষাট বছরের দীর্ঘদেহা মহিলা। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অনেক পরে প্রেসিডেন্সি জেলের স্মৃতিচারণের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন—

“অনেক পরে প্রেসিডেন্সি জেলে মাদাম রাসোর বলেছিলেন, পন্ডিচেরি জেল নো গুং। নো ত্রিস নো চিলড্রেন। উইমেন উইদআউত চিলড্রেন। মেদিনীপুরে দুটোই প্রচুর ‘ত্রিস অ্যান্ড চিলড্রেন।’”^২

মেদিনীপুর জেলে আর একটি মেয়ের সঙ্গে জয়া মিত্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। বাইশ বছরের মাদ্রাজী মেয়ে জয়লক্ষ্মী। তাঁকে কিছু কিছু বাংলা শিখিয়েছিলেন জয়া। তাঁর জেলে আসার কারণ তীর্থভ্রমণের নাম করে তার মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছিল স্বামী। তিনদিন অপেক্ষার পরে চতুর্থদিনে কলাইকুন্ডা যাওয়ার পথে সে ধর্ষিত হয়ে রাস্তায় পরে থাকে শেষে ঠায় হয় পুলিশ হেপাজত, মেদিনীপুর জেল। খাঁদি বউদির অপরাধ ছেলেদের খাওয়ানোর তাগিদে সংরক্ষিত জঙ্গল থেকে কাঠ কাটতে গিয়ে ধরা পড়া। বছর পঁয়তাল্লিশ শশীবিরি জমি সংক্রান্ত মামলায় ছেলে-স্বামীসহ জেলে আসে। সে জেলের মধ্যেও ঘোমটা দিয়ে রাখে। এরকমই শুকনো শরীরের আর একজন বন্দি নলিনী ঘড়ুই। শান্তিবালা কুইলা খুনের কেসোর আসামী। তেরো বছরে এগারোটা সন্তানের জননী সে। চারজন মারা গিয়েও বাকি সাত জনের অন্তঃস্থানে অপারগ শান্তি গলার হার বিক্রি করে শেয়াল মারা বিষ ভাতের সঙ্গে মেখে তার স্বামীকে হত্যা করে। তারপর নিজে গিয়ে ধরা দেয় থানায়। তার বিচারে মানুষ মারলে পাপ হয়, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে।

বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর হলে জয়া জানতে পারেন এখানে সে জেলের মধ্যেও ব্রাত্য। এই স্থানের আবাসিকদের সাবধান করা আছে তার কাছে গেলে ‘মার্কাকটা’ যাবে। এখানে পরিচয় হয় যামিনীর সঙ্গে। সে দুর্গাপুর থেকে এসেছে খুনের আসামী। তার অপরাধ উন্মাদ অবস্থায় স্বামীকে মা কালীর কাছে বলি দিয়েছে সে। তার সঙ্গে এসেছে তার চারবছরের মেয়ে পুষ্প। জেলেও তার উন্মাদনার প্রকাশ পয়েছে ভয়ানক ভাষায়। সে তার নিজের মেয়েকেও বলি দিতে চেয়েছে। যামিনীর উন্মাদনা সুপ্রিমকোর্টে প্রমাণ হলে তার সাজা মুকুব হয় কিন্তু পাগলকে কে বন্দি দিয়ে নিয়ে যাবে সেই কারণে সে জেলে থেকে যায় চিরকালের আবাসিক হয়ে। বহরমপুরে মেয়েদের ওয়ার্ডে পাগলের সংখ্যা বারোজন মতো। তাদের দেখাশুনা করে ষাট বছরের পুষ্প নেইয়া। চালানদেওয়ার ব্যবসায় ধরা পরে সাজা হয়েছে তার। সে দোদণ্ডপ্রতাপী কিন্তু যত্নশীলাও পাগলদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা তার মার্কাকার উপকরণ তাই যতদূর সম্ভব সে কাজে গাফিলতি বা টিলেমি দেয় না। এখানে কর্মরতা মেট ইতোয়ারী, সেও স্বামীকে মসলা ছেঁচার লোহায় মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগে পাঁচ বছরের জেল আসামী। বহরমপুর জেলে সবার পরিচিত সিস্টার শান্তা তামাঙ্গী সেও স্বামী হত্যার আসামী। এসেছে দার্জিলিং থেকে। মেয়াদ সাত বছর। জয়দাদি বিশবছরী। পাঁচ বছর সাজ কেটেছে আরও অন্তত ন’বছর বাকি। তার অপরাধ দু’বার তালুক পাবার পর তিন নম্বর স্বামীকে দা দিয়ে খুন করেছে। তার স্বামী প্রথমপক্ষের মেয়েকে নষ্ট করতে চেয়েছিল বলে তাকে খুন করে। পুষ্প নেইয়া এখানে আট বছরের আবাসিক। মহক্কা বেগম নিজের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তার বাপকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। মাঠে ভাতজল নিয়ে যাওয়া বারো বছরের সোনাভান তাদের মেয়েকে যে পশুর কাম নিয়ে ধর্ষণ করে। বরদাবুড়ি এসেছে কোচবিহার থেকে। বৃদ্ধার ছেলের বৌয়ের ঘরে মহাজন জোরপূর্বক ঢুকে পরলে তার ছেলে তাকে খুন করে। সেই দোষ নিজের মাথায় নিয়ে সে আসে জেলে। বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। স্বামী বাপের বাড়িতে রেখে গিয়েছিল আনন্দ দাসীকে কাকাদের বাড়িতে। তার কলেজ পাশ করা কাকা তাকে বিয়ে করার আশ্বাস দিয়ে ভোগ করে। একদিন ছাদের কিনার থেকে তাকে ফেলে দেয় অথএব বিশবছরী, ছ’বছর জেল খাটা সম্পন্ন হয়েছে এখন তার বয়স সাতাশ। অপরাধ না করেও অপরাধী বিমলা। স্বামী ও দেওরের সঙ্গে বিমলারও ফাঁসির হুকুম হয়। রাষ্ট্রপতির করুণায় যাবজ্জীবন মঞ্জুর হয়। স্বামী ও দেওরের ফাঁসি হয়ে যায়। ফুলমালা বর্মণী বিশ বছরের আসামী। সতীনের ঘরে বিয়ে হয়ে দুটি সন্তানকে পালন করতে অপারগ হয়ে বাচ্ছাদুটিকে বিষ খাইয়ে নিজে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে ও বিফল হয়ে জেলে আসে। বছর ছাব্বিশ সাতাশের বিনোদা পাগল। যতখন সুস্থ থাকে কাঁদে আর অসুস্থ হলে গান করে। ঘরে আগুন লাগার স্মৃতি থেকে সে পাগল হয়। আয়তামাই তার পাশের সেলে সন্তান প্রসব করে। সে পাগল বন্দি, তার সন্তানকে দুধ খাওয়াতে অসমর্থ বলে ছেলেকে সরিয়ে নিলে ছেলেটিও মারা যায়। এখানে সাইদা একটানা আটবছর বন্দি আছে। কমলা ৩০২এর আসামী।

প্রেসিডেন্সি জেলে প্রথম দেখা হয় শিখার সঙ্গে। গোটা বারো চিটিং কেসের আভারট্রায়ালের আসামী সে। তার দু’জন সহযোগী সরযু ও লালমোতি। সরযু একটি মেয়ের গর্ভপাত করাতে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে, লালমোতি ছ’টি

বালিকাকে বিক্রির দায়ে ধরা পরে। এখানে পরিচয় হয় কৃষ্ণগর সঙ্গে। অনন্ত সিংহের গ্রুপের সঙ্গে ট্রাইবুনাল বিচার হচ্ছে। যদিও একবছর সে আগে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে বন্দি ছিল। বিজুর বয়স নয়, আর গণেশের সাত। বিজু বাবাকে চুরি করতে সাহায্য করার অপরাধে এখানে আছে। আর গণেশের মা পাগল তাকে বাড়িতে দেখার কেউ নেই বলে এখানে। মিমুল সেনগুপ্ত একটা লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র ও কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়।

এখানেই পরিচয় হয় বিয়েত্রিশে রাসোর সঙ্গে। মায়া কোনো আসামী নয়। ও সেফকাস্টিডিতে থাকে। আনোয়ারা বেগম লিলুয়া হোম থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে এসেছে খুনের দায়ে। বাপীদি বেশ্যা। জেলের সাধারণ ভাষায় পেটিকেসের আসামী। দু'তিনদিনের সাজা নিয়ে সে এক-দুই মাস অন্তর হাজির হয় কয়েকদিনের জন্য। নূরজাহান IPC-316 ধারার সাক্ষী, ধর্ষিত মেয়ে। পেটে ক্ষিদে নিয়ে স্বামীর চাহিদা পূরণে অসমর্থ নিভা ফিট হতে শুরু করে। ফলে একদিন রাস্তা থেকে জেলে এসে পৌঁছায়। মুকুল, ক্ষিরোদা ছিল ক্রিমিনাল লুনাটিক অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থায় কাউকে খুন করেছে হয়তো! উপন্যাসের শেষের দিকে আসে বর্ধমান থেকে শিপ্রা। সেলে আসে রাজশ্রী আর মীনাঙ্কী।

প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী : জেল-সংকট ও যাপনকর্ম— জেল পরিবেশে সবথেকে সংকট, জলসংকট। উপন্যাস থেকে জানা যায় - পান করার জন্য প্রয়োজনীয় জলও এখানে অমিল। পুরো ফিমেল ওয়ার্ডে একটি মাত্র কল সেটি হাসপাতালে, তার সঙ্গে লাগানো আছে একটা নল। সারাদিনে আধঘন্টা মতো জল আসে সেখান দিয়ে। চারজনের জন্য দেওয়া হয় একটি মাত্র কলসি সেটিও আবার জলের অভাবে প্রতিদিন পূর্ণও হয় না। স্নানের জন্যও জলসমস্যা ব্যতিক্রম নয়। একটা বাঁধানো চৌবাচ্চাতে অর্ধেক ভর্তি করা হয় মেয়েরা তার মধ্যে নেমে কোনোক্রমে স্নান সমাপন করে। সপ্তাহে একদিন কাপড় কাচা সেখানেও একই সমস্যা। সাধারণ ওয়ার্ডে আসার পর জয়া দু'জনের সঙ্গে দেখা করার জন্য জানালে তা গৃহিত না হলে পাঁচদিন হাজার স্ট্রাইক করার পর অনুমতি মেলে।

বহরমপুর জেলে জয়াকে থাকতে দেওয়া হত পাগলদের একটি সেল পরিস্কার করে। জেলে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য লকআপ থাকতেন তিনি। তার কারণ বাইরের রাজনৈতিক পারদ আরও উত্তপ্ত হয়েছিল। এই সেলের মধ্যেই তাকে স্নান, খাওয়া সমস্ত কিছু করতে হত। তার ফলস্বরূপ মেঝেতে রাখা কম্বল, বই, জামাকাপড় সব ভিজে যেত।

জেলে সশ্রম কারাদণ্ড হলে ফিমেল ওয়ার্ডে যেসব কাজ করতে হয় বাগান পরিস্কার, ছোলা থেকে ছাতু তৈরি, চরকায় সুতোর জট ছাড়িয়ে তাঁতের নলীতে পরিয়ে দেওয়া, পাগলদের দেখাশোনা। এছাড়াও হাসপাতালে রোগীদের দেখাশোনা করা এই সমস্ত কাজের জন্য বছরে পনেরোদিন রেমিশন ও মাসে বারোটাকা বেতন পাওয়া যায়। এই বেতনের অর্ধেক তারা জেলে খরচ করতে পারে। বাকি অর্ধেক জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর দেওয়া হয়।

জেল-সমাজে লেনদেন হয় টাকা দিয়ে নয়। জয়া মিত্র ব্যঙ্গ করে লিখেছেন —

“দেওয়ালের এপারে টাকা-পয়সার চল নেই। দু'রকম কারেন্সি চালু। একটু বেশি ক্ষমতা যাদের হাতে, মানে যারা ওয়ার্ডারদের একটু বেশি জিনিসপত্র দিতে পারে তাদের হাতে থাকে বিড়ি। তার ভাগের উঠোন ঝাঁট দেওয়া কাজটা এক সপ্তাহ করে দিলে, তার বদলে দশটা বিড়ি, গায়ে মাখবার তেলের বদলে দুটো বিড়ি, এই রকম।”^৩

এখানের বেশিরভাগ মেয়ে বিড়ির মসলাটা দোক্তার মতো করে খায়। এই নেশার দাসত্ব তাদের বেশিরভাগ জেলে আসার পরে হয়েছে। এই মসলা চুন সহযোগে খাওয়া, চুন আসে সেই নিচুতলার কারেন্সি থেকে। সপ্তাহে একদিন জল খাবারের একমুঠো চিড়ে খাওয়ার পরিবর্তে জমিয়ে রেখে এককৌটো হলে তার বদলে দশপয়সা আন্দাজ চুন পাওয়া যায়। জানা যায় সাধারণ বন্দিদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব জিনিসই বাটার হয়।

প্রেসিডেন্সি জেলে সেলের স্যাঁতসেতে মেঝেতে থেকে স্বাতী আর স্নিগ্ধার ব্রংকাইটিস হয়েছে। এদের নার্সিং করার জন্য জয়াদের অনুমতি চাইলে দেওয়া হয়। স্বাতী তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধরা পরে। পুলিশ কাস্টডিতেই ওর সে সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। এদের অসুখে যে উপকার হয় জয়া জানিয়েছেন সেলে দুপুরে ঘন্টা দুয়েক ছাড়া বাকি সময় সেলের দরজা খোলা থাকে।

‘প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী’ খুব স্বল্পতার মধ্যে যাপন শিক্ষা নিতে দেরি হয় না কোনো জেলে থাকা কয়েদির তেমনই কিছু দৃষ্টান্ত খাবার ছাড়া সারাদিনের বরাদ্দ তিন থালা জলে স্নানের সময় মাথা ধোয়া, ব্লেড দিয়ে চুল ছেঁটে ফেলা, দৈনিক প্রাপ্ত সাত গ্রাম সর্ষের তেল দিয়ে একদিন বাম পায়ে পরের দিন ডান পায়ে ব্যবহার এসবই জেলযাপনের অঙ্গ।

জেল-উৎসব : হাঙ্গার স্ট্রাইক— জয়া মিত্র সাধারণ ওয়ার্ডে থাকলেও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ছিলেন অনেকের প্রিয়। একদিকে কারারক্ষীদের আতঙ্কের কারণ অপরদিকে রাজনৈতিক ও সাধারণ বন্দিদের প্রিয় পাত্রী। এই দু’য়ের সহাবস্থান উপলব্ধি করা যায় উপন্যাস থেকে। জয়া মিত্রের এই উপন্যাসে এমন একটি উৎসব প্রসঙ্গ আছে যা প্রায় অন্যান্য কারাসাহিত্যিকদের লেখায় পাওয়া যায় না। যেমন - কালিপুজোর দু-চারদিন পর দুপুরবেলা ছেলেদের ওয়ার্ডে যাত্রা হয়। সেখানে মেয়েদেরও যাওয়ার অনুমতি থাকে। কিন্তু জয়া যে বছর জেলে আসেন সে বছর যাত্রা স্থগিত হওয়ার উপক্রম হয়, কারণ কারাকর্মীদের প্রত্যাশা সে পালিয়ে যেতে পারে। যদিও শেষ রক্ষা হয়েছিল। অর্থাৎ যাত্রা হওয়া এবং দেখতে যাওয়ার বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া তারজন্য যদিও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সুবোধ, মানস, কাজল এদের নিয়ে যাওয়ার আদেশপত্র এলে এরা গাড়িতে উঠতে রাজি নয়, যতক্ষণ না জয়া এসে তাদের সঙ্গে দেখা করে।

বহরমপুরে চব্বিশ ঘণ্টা জেল বন্ধ থাকার পর ফল-স্বরূপ সে দিন দুয়েক খাবার বন্ধ করে দেয়। এই জেলেই বারোটা লুডো বোর্ড, ছ’প্যাকেট তাস আসার খবর আসে। পুষ্প নেইয়ার ধারণা জয়া জেলে আছেন বলে এই আয়োজন। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বইয়ের বারো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলার অপরাধে লাইব্রেরি থেকে বই খবরের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবসর যাপনের জন্য বাধ্য হয়ে তাই সারাদিন দু’হাতে লুডো খেলে কাটাতে হয়েছে। প্রায় দুইমাস। অষ্টমী পুজোর দিন জেলে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট— মেলওয়ার্ড থেকে কফি আসে।

জেলে শিবরাত্রির উপোস করলে ডায়েট পাওয়া যায়। ছয়জন কয়েদি পিছু একটা নারকেল, একচামচ চিনি, দুমুঠো সাবু, কড়ে আঙুলের মাপে একটা কলা আসে।

প্রেসিডেন্সি জেলে জয়া বিদ্রোহ করেন। যারা একই অপরাধে অপরাধী তাদের একসঙ্গে থাকতে দিতে হবে। তারা আরও দুটি কাজ করে। এক, গুণতিতে তারা বসতে অনিচ্ছুক হয়। দ্বিতীয়, খাওয়ার পর সারারাত একসঙ্গে গল্প করা। কৃষ্ণ কে আলাদা সেলে নিয়ে যেতে এলে বাধা দেওয়ার অপরাধে তাদের উপর লাঠি চালানো হয়। তবুও তাদের জেদ বজায় থাকল কৃষ্ণ, স্বাতী, ডালিয়া, মিন্ধা সহ জয়া মিত্র পাঁচজনকে সেলে বন্দি রাখা হয়।

এখানকার সকালের খাবারকে জয়া বলেছেন ‘অপেক্ষাকৃত নাগরিক’। মেদিনীপুর বা বহরমপুরের মতো ভুট্টার খিচুড়ি না দিয়ে একদিন করে চিঁড়ে-মুড়ি-ছোলাসেদ্ধ এবং সপ্তাহে একদিন পাঁউরুটি পাওয়া যায়।

জেলে স্বাচ্ছন্দ্য বলতে তেমন কিছুই নেই। তবুও হাসপাতালে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা আছে। জয়া মিত্র স্বেচ্ছায় সেগুলি ত্যাগ করে সাধারণ ওয়ার্ডে আসেন। এই স্বল্প-স্বাচ্ছন্দ্যটুকুই জেলের উৎসব, আর স্বল্প-অধিকার বুঝে নেওয়ার উপায় হাঙ্গার স্ট্রাইক।

জেল ট্রান্সফার : রয়ে যায় স্মৃতি (স্থান বদল, নাম বদল, ঠিকানা বদল) — মেদিনীপুর জেলে চারমাস ছিলেন। তারপর ট্রান্সফার হয় বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল’-এ। পিছনে রেখে যাওয়া বেদনার্ত স্মৃতিথেকে লিখেছেন—

“... পিছনে রেখে যাই ওদের সকলকে, বাতের ব্যথায় অনড় সৌদামিনী, দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাওয়া পাঞ্জাবী পাগলী, পুরুলিয়ার গ্রাম থেকে আসা কালো পাথুরে চেহারার সরস্বতী মেঝেন আর তার কোলের দু বছরের প্রাণমনিকে, — যে আমাকে তাদের বাড়ি যেতে নিমন্ত্রণ করেছে। আর রেখে যাই জ্বলজ্বলে তারার মত এক ছেলে, আমার মণিদাকে। আর কখনও খবর পাইনি তার।”^{৪৮} এই ফেলে যাওয়ার স্মৃতি বেদনাদায়ক।

বহরমপুর জেলে আন্ডারট্রায়াল মেয়েদের সংখ্যা কম। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেল থেকে আসা ‘লাইফার’ অর্থাৎ লম্বা সাজা পাওয়া বন্দিদের এনে রাখা হয় এই জেলে। আড়াই বছর পরে আবার ট্রান্সফার হয় ‘প্রেসিডেন্সি জেল’-এ। কালীপুজোর মাঝরাতে জেলে পৌঁছান। এই জেলের স্মৃতি থেকে জয়া লিখেছেন—

“উঠোনে ঘোরাফেরা করছে বন্দি মেয়েরা, যেন মানুষের ভাঙাচোরা টুকরো। ক্লান্ত, বিবর্ণ হতশ্রী। প্রেসিডেন্সী জেল মহানগরীর তলানি ফেলবার জায়গা। এর নাম ‘বি-ক্লাস’ জেল। এখানকার বাসিন্দারা প্রায় প্রতিদিন আসা-যাওয়া করে। বেশিরভাগ আন্ডারট্রায়াল — হাজতী।”^৫

যখন কোন বন্দিনী অন্য জেল থেকে আসে তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয় কিছুদিন তাকে অস্থির করে তোলে। তারপর ধীরে ধীরে সব সহনীয় হয়ে ওঠে। জয়া মিত্র লিখেছেন —

“প্রতিটা দিনই ঘন্টা মিলিশে আগের দিনের মত। কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমানও না; কোন ঋতুচক্র নেই, না আছে কোনো সুখদুঃখ ভালোমন্দের ব্যতিক্রমী তরঙ্গ। যে মানবগোষ্ঠী এখানে সম্পূর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে খায় শোয় কাজ করে তারা প্রত্যেকে বাস করে একটি মাত্র কালের মধ্যে — অতীতকালে, এবং সে অতীত যাপনে প্রত্যেকেই অতী ব্যক্তিগত।”^৬

তিনি আরও বলেছেন এখানে শৃঙ্খলায় কারো অভ্যাস নেই ভালোরও না মন্দেরও না।

প্রেসিডেন্সি জেলে জয়ার মনে পরেছে অনন্তদার কাছে শোনা বক্সা থেকে প্রেসিডেন্সিতে আসার ঘটনা। সার্চ করা হলে তাদের কাছে পাওয়া যায় ‘তবলা তরঙ্গিনী’ এই বইয়ের নাম লিষ্টে নেই তাই দেওয়া যাবে না। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে টেলিফোনের উত্তর আসে তাদের ‘তবলা অ্যালাউড—তরঙ্গিনী নট।’

জেল সবার জন্য সমান কষ্টদায়ক নয়। প্রেসিডেন্সি জেলে আসে মিমুল সেনগুপ্ত। তার বাবা ফ্রান্সে বসবাস করেন। ওর বাবা জেলে দু’দিন দেখা করতে এসে মেয়ের জন্য প্রচুর সিগারেট, লাইটার, শুকনো খাবার, কফি, গুঁড়ো-দুধ, সাবান, তোয়ালে দিয়ে যান। মাসখানেকের মধ্যে সে চলে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায় কিছু জার্নাল ও ভালো বই দিয়ে পাঠাবে। একই জেলে জয়া মিত্রের মা ও মেয়ে দেখা করতে এলে তাকে পুলিশ দপ্তর থেকে সার্টিফিকেট এনে জমা দিতে হয়েছে। দু’দিন অপেক্ষার পর পনেরো মিনিট দেখার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষেও ইউরোপীয়-অপরাধী বন্দিদের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকে। মাদাম রাসো ফ্রান্সের জাতীয় ভূগোল পরিষদের সঙ্গে যুক্ত, তাঁর ভিসা ফুরিয়ে যাওয়ায় তাকে এখানে আসতে হয়। তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকলেও তিনি সেগুলি বর্জন করে সাধারণ খাবারই নিতেম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মেরি কার্পেন্টারও একদিন এই প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন।

জেল কোড : নিরাপত্তাহীন ব্যবস্থা ও হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ— জয়াদের প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রি হওয়া বইও পড়ার অনুমতি ছিল না। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি বার্ত্রান্ড রাসেলের ‘War Crimes in Vietnam’ কি ‘রুশজার্মান যুদ্ধের ইতিহাস’ কিংবা গোর্কির ‘মা’ ভিতরে নিয়ে আসার জন্য তাদের কৌশল করতে হয়। জয়া লিখেছেন—

“আর একথা বোধ হয় সত্য, যে পরাধীন আমলে অন্তত রাজনৈতিক বন্দিরা, স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক কারণে বন্দিদের থেকে অনেক বেশি নিরাপত্তা পেয়েছেন। আন্দামানের সেলুলার জেলকে বাদ দিলে, বৃহত্তর বাংলায় জেলে গুলিতে হত্যার ঘটনা একটি—হিজলী। ১৯৭০-এর ডিসেম্বর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের জেলে গুলি বেয়নেটে নিরস্ত্র বন্দি কিশোর-তরুণদের হত্যার ঘটনা পনেরোটি। নিহতের সংখ্যায় সরকারি হিসেবেই ৬৫। আহত ৩১০ জন। প্রকৃত সংখ্যা এর অনেক অনেক ওপরে।”^৭

১৮৭৬ সালের জেলকোড অনুযায়ী দু’বছরের ছোট বাচ্চা থাকলে আর পরিবার যদি তাদের ভার নিতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে সে মায়ের সঙ্গে হাজতে থাকতে পারে। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এই কোড পরিবর্তন হয়ে শুধুমাত্র দু’বছর থেকে ছ’বছর করা হয়।

লিলুয়ায় যে কিশোর-কিশোরীরা হোমে বন্ধ থাকে তাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানসিক বিকৃতির উদাহরণ পাওয়া যায় আনোয়ারা বেগমকে দেখে। “সমকামিতা ওখানে বাচ্চা থেকে পৌড়ার সবচেয়ে স্বাভাবিক (?) আউটলেট।” আনোয়ারার সঙ্গিনী নতুন আসা মেয়ের সঙ্গে মিশেছে বলে তাকে খুন করেছে।

পাগলবাড়ি প্রসঙ্গে জয়া মিত্র লিখেছেন—

“পাগলবাড়ির ভেতরের অবস্থা বর্ণনা করার মত কলম আমার নেই। চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহ রাখবার মত বড় খাঁচা। একটা কি দুটোর ওপর পাকা ছাদ। মাঝখানে একটার ছাদ টিনের। ভেতরে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। তারই মধ্যে কেউ কেউ দেয়ালে গাঁথা কড়ার সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা। অনেকেই বাঁধা নয়। মাঝখানের টিনের ছাদঅলা খাঁচাটার দরজা বন্ধ। বাইরের থেকে ভাত তরকারি থালা করে নয়— হ্যাঁ, ছুঁড়ে দেওয়া হয় মাটিতে। কাড়াকাড়ি করে খায় মানুষেরা! যাদের গায়ে আর শক্তি নেই তারা দারে থাকে, আরো বেশিদিন না খেয়ে থাকে!”^৮

আধিকারিকদের চিন্তা থালায় ভাত দিলে তারা মারামারি করতে পারে নিজেদের মধ্যে। হাড়সার নগ্ন শরীর সব। কাপের দিলে যদি গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। শীতের দিনে কস্বল দেওয়ার প্রয়োজন নেই, পাগলদের আবার শীত লাগে! জয়া মিত্র জানিয়েছেন প্রতিবছর শীতে প্রেসিডেন্সি ফিমেল ওয়ার্ডে বার চন্দোজন পাগলের ‘Natural deth’ হয়। উপন্যাসের শেষে এমনই একজন পাগলের শবদেহ সাদা কাপড়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে শেষ হয়েছে।

আত্মকেন্দ্রিক দহন কথা : জেল জীবনের স্মৃতি— জয়া মিত্র ‘জেলখানায় লেখা সত্তর’ সম্পাদনা শুভেন্দু দশগুপ্তের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ৪ অক্টোবর ১৯৭২-এ একটি কবিতা লেখেন ‘মাণিক আমার ভাই’। এই কবিতাটির সম্পর্কে জানিয়েছেন—

“১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রধান ফটক আক্রমণ করেন বিপ্লবীরা। গুলিতে নিহত হন সঞ্জয়। তাকে সবাই ডাকত মাণিক বলে।”^৯

অপরদিকে যখন কবিতাটি লিখছেন তখন জয়া মিত্র প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। এই তথ্য পাওয়া যায় অপর একটি কবিতা থেকে। কবিতার নাম ‘নিহত সাথির জন্য’, তারিখ— প্রেসিডেন্সি জেল, অক্টোবর, ১৯৭২। লক্ষণীয় দুটি কবিতার শেষের কয়েকটি লাইন - এক “...তোমার আলোয় দেখতে পাব/ ব্যথায় ছেঁড়া হৃদয়খানা/ হাতের মুঠোয় ধরে/ মায়ের মানিক ভাইটি আমার/ তোমার পথেই আমরা যাব।”^{১০} (সামান্য কিছু পার্থক্য আছে) নিহত সঞ্জয় ওরফে মাণিক যে তাদের কতোটা প্রিয় ছিল এবং এক জেল থেকে আরেক জেলে নিহত হওয়ার সংবাদে জয়া মিত্রের যাপিত সময়ের মর্মান্বহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য দুটি কবিতার উল্লেখ করা হল।

‘জেলখানায় লেখা সত্তর’ গ্রন্থে জেলের গান নিয়ে তাঁর লেখা— “একাত্তরের একেবারে শেষ দিকে বহরমপুর জেলের অফিসে একদিন তিমিরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির তিমির সিংহ, আমাদের সবার প্রিয় তিমির। ... তিমিরের ভরাট সুরেলা গলা ভাসছে জেল অফিসের বুলপড়া বন্ধ বাতাসে। শহীদ স্মরণের সেই গান ‘জন্মিলে মরিতে হবে রে/ জানে তো সবাই/ তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই/ সব মরণ নয় সমান।’” এই গান যে কেউ শব্দ দিয়েছে বা সুরারোপ করেছে এমন মনেই হয়নি তাদের। তখনকার তীব্র পীড়নে, জেলের মাটি থেকে, লুটিয়ে পড়া আহত সাথীদের বুকের মধ্যে এ গান সৃষ্টি হয়।” প্রদীপ এবং প্রবীর রায়চৌধুরীর মা’কে চিঠি লিখেছিলেন জয়া। যাদের সঙ্গে তাঁর কোনো আলাপ হয়নি। একটি সময়ে একটি সমাজ কেমন করে আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলে সকলের হয়ে উঠেছিল সে বিবরণ এই চিঠিতে আছে। চিঠির তারিখ ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৬ (প্রেসিডেন্সি জেল) তিনি লিখেছেন— শ্রদ্ধেয় মা, ... আমরা এক ওয়ার্ডে ১৪ জন মেয়ে থাকি। সবাই নানা জায়গা থেকে এসেছি। ধরা পড়ার পর সবাই সবার সাথে পরিচিত হয়েছি, এটা নিজেরাই গেছি ভুলে। মনে হয় আমরা যেন একই মায়ের স্নেহচ্ছায়ার একই নীড়ে লালিত পালিত হয়েছি।”^{১১}

স্মৃতিকথার আড়ালে জেলদর্পণ— উপন্যাসের মুখবন্ধে জয়া মিত্র জানিয়েছেন সেই দশক ও সাধারণ মনে জেল ধারণা সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন - “জেল সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভয় ও অপরিচয়কে সত্তর দশক ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ব্যাপক সাধারণ মানুষের মন থেকে। সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়েছিল সেই বিপুল ভাঙচুর আর জন-জোয়ারের দশক।” তিনি জানান অন্য সমাজের গল্প। যাঁরা এই দশকে বিপ্লব করেছিল তাঁরা জেনে বুঝে (বন্দিত্ব, অত্যাচার, মৃত্যু) করেছিল। কিন্তু জেলে শুধু এরাই থাকে না থাকে আরও অনেক রকমের অপরাধী, অন্ততঃ সমাজের ও আইনের চোখে। এইসব মানুষদের জেলখানার যাপনকথা এই উপন্যাস। তিনি অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন - ‘এ-বই আমার রচনা নয় বলেই মনে করি। যা আছে আমি শুধু তাই দেখাতে চেয়েছি, যদি এইসব, আরও সাথীরা এগিয়ে আসেন আর বইটির শেষ অধ্যায় সকলে মিলে

রচনা করা যায়! ভূমিকা বা মুখবন্ধ থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি কোন বিষয় নিয়ে লিখতে চেয়েছেন, এবং কারা এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। এই প্রসঙ্গে শ্রেয়া রায় লিখেছেন—

“জয়া বা মীনাক্ষীর জেল জীবনের আখ্যান বহুমাত্রিক। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার, রাষ্ট্রীয় পীড়নের বিবরণ দিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে। তাঁদের বক্তব্যে ‘আমি’র পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা শব্দটি।”^{১৩}

জয়া মিত্র জেলে রাজনৈতিক বন্দিদের (‘A’-Class) সুবিধা নিয়ে যেমন জেল যাপন করেননি, তেমনিই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্ণনা করে গ্রন্থটিকে গুরুভার করেননি। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিয়া দাস লিখেছেন—

“জয়া মিত্রের এই উপন্যাসে (হন্যমান) তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের চারণভূমি হয়ে ওঠেনি, বরং প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সহবন্দিদের কথা। উপন্যাসটিতে তাঁর ব্যক্তিগত বন্দিজীবনের স্মৃতিকে ছাপিয়ে গেছে এক মানবিক আর্তি।”^{১৪}

অবশ্যই এটি একটি সময়ের দলিল কিন্তু এই গ্রন্থে সেই সময়ের রাজনীতি গৌণ হয়ে যাপিত জেলজীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি মূখ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিয়া দাস অন্যত্র জানিয়েছেন—

“মীনাক্ষী সেন, জয়া মিত্র তাঁদের স্মৃতিকথায় এই জেলজীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের স্মৃতিকথা রাজনৈতিক চেতনার দর্পণ হয়ে ওঠেনি বরং কারা-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অ-ব্যবস্থাকেই মূখ্য করে তুলেছেন।”^{১৫}

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেলে প্রবেশ হলেও তিনি সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে মিশেছেন তাঁদের জানতে বুঝতে চেয়েছেন। যদিও এর পরিণাম সবসময় ভালো হয়নি! কারণ, নকশাল বন্দিদের সঙ্গে সাধারণ বন্দিদের মেশা ছিল অলিখিত আইনসম্মত অপরাধ, যার লঙ্ঘনে প্রহার, অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে সাধারণ বন্দিদের। তবুও তাদের আটকে বা আইনের সালিশি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি তারা মিশেছে, প্রকৃত হয়েও কথা বলেছে। এই বন্দিদের থেকে নিজেদের আলাদা করার চেষ্টা তাঁরা করেননি।

জয়া মিত্র ‘হন্যমান’ লেখার আগে পর্যন্ত তিনি কবিতা লিখেছেন। ‘হন্যমান’ তার লেখা প্রথম গদ্য। কেমন করে কবির মধ্যে গদ্যের জন্ম হল সেকথা ব্যক্ত করলেন অনেক পরে। তিনি জানিয়েছেন—

“যে কথা, যাদের কথা না লিখে পরিব্রাজ ছিল না, সেই সকল অভিজ্ঞতা লেখার মতো কবিতার ভাষা আয়ত্ত হবে না একথা বুঝতে দেরি হয়নি। কবিতা ছিল আমার কাছে কিছু শব্দ দিয়ে ঘিরে রাখা নিরবতা। ...গদ্য লিখবো বলে কোনো উদ্যোগ নিয়ে শুরু করিনি, সাংকেতিকতার প্রাকার আপনিই জায়গা ছেড়ে দিল গদ্যের শব্দকে। ‘হন্যমান’-এর ভাষায় তার চিহ্ন স্পষ্ট।”^{১৬}

Reference:

১. মিত্র, জয়া, *হন্যমান*, অষ্টম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০২২, পৃ. ১১
২. মিত্র, *হন্যমান*, পৃ. ১৬
৩. মিত্র, *হন্যমান*, পৃ. ৩১
৪. মিত্র, *হন্যমান*, পৃ. ২২
৫. মিত্র, *হন্যমান*, পৃ. ৭৮
৬. মিত্র, *হন্যমান*, পৃ. ৩৬
৭. মিত্র, *হন্যমান*, পৃ. ৯১
৮. মিত্র, *হন্যমান*, পৃ. ১৩৩
৯. দাশগুপ্ত, শুভেন্দু, সম্পাদক, *জেলখানায় লেখা সত্তর*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঠিকঠিকানা, ২০২২, পৃ. ১৭১

১০. পুরকায়স্থ, রাহুল, সম্পাদক, *বঙ্গমানিক দিয়ে গাঁথা : রক্তাক্ত সত্তরের কবিতা দলিল*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ধানসিড়ি, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ১২৬
১১. দাশগুপ্ত, *জেলখানায় লেখা সত্তর*, পৃ. ২৬২-২৬৩
১২. দাশগুপ্ত, *জেলখানায় লেখা সত্তর*, পৃ. ৩৮২
১৩. রায়, শ্রেয়া, 'দিনবদলের দুই রাজনৈতিক বন্দিদের লেখায় জেলবন্দি নারীদের কথা', *নিষ্পলক*, সম্পাদক জগদীশচন্দ্র সরদার, সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫, পৃ. ৩৫
১৪. 'হন্যমান' : নিহত স্মৃতির কথকতা', *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি (১৯৪৭-২০২০)*, সম্পাদক অজয় সাহা, আশাদীপ, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ৪২৮
১৫. দাস, সুপ্রিয়া, 'আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার প্রেক্ষিতে জেল জীবনাশ্রিত আত্মকথা', *কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, সম্পাদক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্দশ সংখ্যা, ২০২৪, পৃ. ৪৩
১৬. *কোরক সাহিত্য পত্রিকা: আড়াই দশকের বাংলা ছোটগল্প (২০০১-২০২৫)*, শারদ সংখ্যা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, ২০২৫, পৃ. ২৬৪